# সত্যি বলছি

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

প্রাপ্তিস্থান
ইষ্টার্ণ ল হাউস লিঃ
কলিকাতা

যে গল্পটা বলবো এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে কথা নেই। কারণ মিথ্যে কথা অনেক সময় সত্য ঘটনাকে বিশ্রী করে' দেয়।

গত বছর শীতকালের কথা। বাঙলা দেশ থেকে একটু দূরে একটি ছোট সহরে নেমে ভাবলাম, কোথায় যাওয়া যায়। আগের দিন রাতে ট্রেণে ভারি কষ্ট গেছে। একখানা মাত্র কম্বলে কি আর ওদেশের শীত আট্কায় ?

সোজা গেলাম বাজারের দিকে কিছু কিনে খাবার জন্যে। পথে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছি। একটি বাড়ীর দালানের ওপর একটি মোটাসোটা লোক ইজিচেয়ারে কাৎ হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আর একটি চাকর মেজের ওপর বসে' তামাকের কল্‌কেয় ফুঁ দিচ্ছিল। বাঙ্গালী ওদেশে বিশেষ নেই, লোকটিকে দেখে খুসী হ'য়ে কাছে গিয়ে বললাম—এদিকে বাজারটা কোথায় বল্‌তে পারেন ?

খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বুড়ো লোকটি আমার দিকে হাঁ করে' খানিকক্ষণ তাকালো। বয়স তার পঞ্চাশ বোধ হয় পেরিয়ে গেছে। মাথায় এক মাথা টাক। দুই পায়ের ওপর তার ভুঁড়ি নেমে এসেছে। গায়ের রঙ চক্‌চকে কালো। চোখ দুটো ছোট ছোট। বল্‌ল—বাড়ী কোথায় ?

—বাঙলা দেশে।

—এখানে ?

বললাম—এমনি, এই দেশ বেড়াতে আর কি।

লোকটার চাউনি দেখে আমার ভয় হচ্ছিল। বল্‌ল—সন্ন্যাসী নাকি ?

বললাম—গায়ে ত আমার গেরুয়া নেই।

—হুঁ, তা বেশ, আর কোথাও যেতে হবে না, এখানে

াঙালী এলেই আমার বাড়ীতে অতিথি হয়। এসো, উঠে

একটা মোটা মোটা লোক কাৎ হয়ে খবরের কাগজ
পড়ছে আর একটী চাকর……

এসো—ওরে রামনন্দন, যা বাবুর জল খাবারের বন্দোবস্ত করে' দে—

রোয়াকের ওপর উঠতেই একপাল ছেলে-মেয়ে ভেতর থেকে ছুটে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। সবাই বল্‌তে লাগল,—কে তুমি? কে? ওগো, আমাদের জন্যে পেয়ারা এনেছ? ইঃ লোকটা কি পাজি দেখ্‌ ভাই!

ছেলে-মেয়ে ত নয়, একদল সৈন্য-সামন্ত।

রামনন্দন উঠে দাঁড়িয়ে হিন্দি ভাষায় বল্‌ল—জলখাবারের পয়সা দিন্‌ বাবু?—যা যা, হতভাগা! পয়সা অমনি গাছে ফলে! জানিসনে মাসের শেষ? যা নিয়ে আয় এখন কোনো রকমে।

—আজ্ঞে এবার ধার করতে গেলে দোকানদার লাঠি নিয়ে—

বাবু তাকে চোখ টিপতেই সে চুপ করে’ গেল।

ততক্ষণে একটা ছেলে আমার কোলে চড়ে’ কাঁধে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর একটা মাথার চুল ধরে’ টান্‌ছে, অন্যটা জামার পকেটে হাত পুরে’ দিয়ে পয়সা-কড়ি বার করবার চেষ্টা করছিল। একজন হাতের ওপর একটা কামড় দিয়ে পালিয়েছে। পরের ছেলে, কিছু ত আর বলা যায় না!

বাবু বললেন—সাম্‌নের ওই ঘরটায় এঁর থাকার বন্দোবস্ত করে’ দে রামনন্দন। ভেতরে রান্নাবাড়ীতে খবর

দিয়ে আয়—তুমি যাও, ওই ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়ো গে? ওটা কি, পুঁট্‌লি? পয়সা-কড়ি, পুঁট্‌লি—এসব কিন্তু সাবধানে রেখো, কি জানি যদি···বলা ত' যায় না, যে দিনকাল! —আঃ, কি করিস রে তোরা? কেন ওঁকে নাকাল্‌ করিস্‌? আচ্ছা হবে, হবে—যাবার সময় উনি তোদের খেলা কিন্‌বার পয়সা দিয়ে যাবেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এদেশে কদ্দিন থাকার ইচ্ছে?

বললাম—এসে পড়েছি, শুধু আজকার রাতটা—কালকেই আমার যাওয়া দরকার!

বাবু বললে—ও, তা বেশ।—আর আমাকে এখানে সবাই চেনে। আমি এখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট!

এই বলে' তিনি ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর এমনি বিরাট দেহ যে প্রথমবার তিনি সক্ষম হলেন না, দ্বিতীয়বার ভুঁড়ি তুলে' এমনি কায়দায় উঠতে গেলে পাছে আবার আমার নজরে পড়ে এজন্যে তিনি বসে বসেই বললেন,—যাও, ঘরে গিয়ে সব দেখে নাও গে?

ছেলে-মেয়ের হাত ছাড়িয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। এ রকম ছেলেপুলের অত্যাচার আমি আর কোথাও দেখিনি।

আমি যখন ঘরে ঢুকেছি, বাবু তখন চুপি চুপি বলছেন

একবার হাতটা ধর্‌তো রামনন্দন, উঠি। ছি ছি, দোকানদারের কথাটা কেন বল্‌লি ওঁর কাছে? ও যে বাইরের লোক তা হুঁস নেই? মান বাঁচিয়ে এখনও চলতে শিখলিনে? মাইনে পত্তর দিয়ে এবার তোকে ছাড়িয়ে দেবো।

রামনন্দন বল্‌ল—আগে ত দিন্ মাইনে চুকিয়ে! চার মাসের বাকি। এবার মাসকাবারে যদি টাকা না দেন্ ত'—

হা হা করে' বাবু হেসে উঠলেন—রাগ করিস্ কেন? হাকিমের বাড়ী চাকরী করতে গেলে রাগ ভুলতে হয় এ কথা জানিসনে?

* * * *

এক সময় রামনন্দন এসে বল্‌ল—এ বাড়ীতে ঢুকলেন বাবু, খুব সাবধান।

বললাম—একটা টাকা হারালো রামনন্দন!

—হারালো? টাকা? ছেলেপুলেরা পকেটে হাত দিয়েছিল? ওঃ বুঝতে পেরেছি, এই মাত্র ধামায় করে' বাবুর বাজার এলো যে! বললে বিশ্বাস করবেন না, এই সব ছেলে মেয়েদের শেখানো আছে।

আমি বললাম—এ নিয়ে তুমি যেন আর গোলমাল ক'র না।

রামনন্দন বল্‌ল—আজ্ঞে না, এ আমার সয়ে' গেছে।

ছুটির বার হাকিম আজ আর বেরোবেন না। অতিথি-সৎকার করবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

জলখাবার আর এল না। যাক্ গে। স্নান করবার জন্য তৈরী হলাম। গরম জল তৈরী হল। একটি ছেলেকে ভেতরে গিয়ে তেল আনতে পাঠালাম। 'এনে দিচ্ছি, দাঁড়ান—' বলে, সেই যে সে পালালো আর এলো না। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা চলে! গরম জল খানিক মাথায় ঢেলে গা মুছলাম।

তারপরে খাওয়া। তা খাওয়ার আয়োজনটা নিতান্ত মন্দ হয়নি। তরকারী অনেক রকম। এক বাটি দুধ। মিষ্টান্ন। কলা। আমার রসনা সক্ সক্ করছিল।

খেতে এসে যেই বসলাম, অমনি সেই ছেলের দল কোথা থেকে এসে আমায় ঘিরে বসলো। বাচ্ছা কুকুরটা এল, পুষি মেনিটাও এসে জুট্‌লো।

হাকিম বললেন—বসো দাদা?

হাকিমের স্ত্রী বললেন—বসো ভাই?

ছেলের দল দেখে আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবুও যখন খেতে বসলাম, হাকিম সস্ত্রীক সামনে থেকে সরে গেলেন। আমি ভাতে হাত দেবামাত্রই

ছোট ছেলে দুটো আমার পাত থেকে তুলে তুলে খেতে আরম্ভ করল। একজন দিল ডালের বাটিতে হাত ডুবিয়ে। আর একজন বেগুন ভাজাখানা তুলে নিয়ে পালালো। আমি হাঁ করে রইলাম। কাছে যে ছোট মেয়েটা বসে ছিল, তাকে বললাম—ভেতরে গিয়ে তোমরা খাওগে! সে বল্‌ল—না, মা শিখিয়ে দিল তোমার পাতে বসতে।

আমি তাড়াতাড়ি খেতে পারিনে কিন্তু তারা পারে। ঝোলের বাটিটা পাতের ওপর ঢালতেই একজন পিছন থেকে এসে মাছখানি তুলে নিয়ে দিল ছুট্। ছোট খোকা কাছেই বসেছিল, সে দেখল তার দাদা আর দিদিরা তার সঙ্গে পাল্লায় ডিঙিয়ে গেছে। সে হঠাৎ দুধের বাটিটা দু' হাতে তুলে চুমুক মারল। ওই টুকু ছেলে, দেখতে দেখতে এক বাটি দুধই খেয়ে দিল! বাকি ছিল কলাটা, তিন চারজন মিলে সেটাকে নিয়ে এমন টানা হেঁচ্ড়া স্বরু ক'রে দিল যে তার আর পদার্থ রইল না। শেষকালে সবাই যে যার হাত চাট্‌তে লাগল। হিসাব করে' দেখলাম, আমার জন্যে শুধু রইল চারটিখানি ভাত আর একটু নুন।

রাগ করব কার ওপর? এই নুন-ভাতই বা ক্ষুধার সময় কে পায়? আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ

লোকের এই নুন আর ভাত ছাড়া আর কিছুই জোটে

একপাল ছেলে মেয়ে আমায় ঘিরে দাঁড়াল

না। আমিও ত' সেই দেশেরই সন্তান!

হাত ধুয়ে যখন বাইরে এলাম, হাকিম বললেন—কেমন ?

আমি বললাম—চমৎকার !

—কোনো কষ্ট হয়নি ত খাবার ?

—না না, কষ্ট আর কি, ভালই হয়েছে।

বললাম—আশ্চর্য্য রকম। অদ্ভুত! এমন খাওয়া বহুদিন খাইনি।

হাকিম বললেন—আমার বাড়ীর খাওয়া এমনিই ভাই। লোককে ভাল করে' খাওয়াতে পারলে আমার স্ত্রী আর কিছু চান্‌ না। আর তা ছাড়া হাকিম বলে' এখানে সবাই খাতির করে' কিনা, অনেকেই দয়া করে' আমার বাড়ীতে এসে অতিথি হন্‌—আহারের আয়োজনটা আমার বরাবরই এমনই। ওরে রামনন্দন, পান দিয়ে যা নতুন বাবুকে !

ওদিক থেকে রামনন্দন তৎক্ষণাৎ বলে' উঠল—পানের খরচ কি আপনার আছে যে দেবো ? বৌমা ত বলে' বলে'—

—আঃ চুপ কর্‌—অত মুখ ঝাম্‌টা দিসনে,—তবে যাক্‌, এর পান খাওয়া অভ্যেস নেই।

কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

বিকাল পর্য্যন্ত ছেলের দলকে নিয়ে অস্থির হয়ে রইলাম। আমাকে তারা এতটুকু বিশ্রাম করতে দিল না। এক এক জন এসে ঝড়ের মত আমাকে ওলোট পালোট করতে লাগল। বাইরের লোক বলে' তারা এতটুকু সমীহ করল না।

একজন পিঠের ওপর উঠে 'হেট্ ঘোড়া হেট্' করতে লাগল। আর একজন আন্‌ল একখানা ভাঙা কাঁচি, লুকিয়ে আমার মাথার চুল কেটে দিয়ে পালাবে। টুনি দিলে আমার নতুন কাপড়খানা চড়্ চড়্ করে' ছিঁড়ে। আর ভুলু ছেলেটি ভয়ানক। তার হাতে ছিল একটি আল্‌পিন্। হঠাৎ এক এক সময় গায়ের ওপর ফুটিয়ে দিয়ে হো হো করে' হেসে উঠছিল। হাকিম ভেতর-বাড়ীতে ঘুমুচ্ছিলেন, রামনন্দন কোথায় গেছে কে জানে—আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেয় কে? চীৎকার করে' বাড়ীর গিন্নীকে ডাক্‌বো? ছি ছি, লোকেই বা তা হলে বলবে কি!

একজনকে চোখ রাঙালাম, কিন্তু সে এমনি চীৎকার করে' কান্না ধরল যে তাকে থামাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তার অত্যাচার বরং সহ্য হয় কিন্তু তার কান্না ভয়ানক। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—চার আনার পয়সা দাও তবে কাঁদবো না।

চার আনার পয়সা তাকে দিতেই সে হঠাৎ কোল থেকে নেমেই ভেতর বাড়ীতে ছুটতে ছুটতে চলল। যে যা পায় তাই নিয়ে বাড়ীর ভেতর ছোটে। ছেলেমেয়েগুলো তাহলে নিতান্ত বোকা নয় দেখছি !

যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়ে বিকাল বেলাটা কাট্‌লো। তারপর হলো সন্ধ্যা। হাকিম বললেন—রাত্রে লুচির ব্যবস্থাই করলাম। অত বেলায় খেয়েছ, হয়ত ক্ষিধে নেই ; যাই হোক যা দু চারখানা পারো—

বললাম—হাঁ, তাই যা হোক করে'—

ক্ষুধায় তখন আমি অন্ধকার দেখছিলাম।

সন্ধ্যার পরই ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাঁচ্‌লাম। রাতের আহারটা তা হলে আর লুঠ্‌-তরাজ হবে না বোধ হয়। আর লুচি যখন হচ্ছে তখন যা হোক ও-বেলার শোধ নেওয়া যাবে। রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে' আমি ক্ষুধাটা আরো বাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

আমায় যেখানে খেতে দেওয়া হল সেখানে আর কেউ ছিল না। প্রকাণ্ড বড় একখানা থালায় করে' খাবার এল। সত্যই লুচি। সঙ্গে বাটিতে ডাল আর খানিকটা তরকারী।

'এত কেন? এত না দিলেই হতো'—এই বলেই বসে পড়লাম। ও হরি! বসে' দেখি এতটুকু-টুকু তিনখানি মাত্র লুচি!

হাকিম ও-ঘর থেকে বলে' পাঠালেন—যা দরকার হয় চেয়ে নিও কিন্তু।

তিন গ্রাসে তিনখানি লুচি আমার শেষ হয়ে গেল। দাঁত টের পেলো আমি কিছু খেলাম, পেট টের পেলো না। হিন্দুস্থানী একটি ছেলে যে পরিবেশন করেছিল, যাবার সময় সে বলে' গেল, যা দরকার হয় চেয়ে নেবেন।

দরকার হল দু' মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে চীৎকার করাও চলে না, এবং করলেও কেউ শুন্‌তে পাবে না। করুণ দৃষ্টিতে অসহায়ের মত চারিদিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' তাকালাম। ডাকাডাকি করলাম বটে কিন্তু কেউই শুনতে পেল না। অনাহার বরং সহ্য হয় কিন্তু অল্পাহার আমার মত মানুষের অসহ্য।

নিরুপায় হয়ে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল শীতকালের দিন খেয়ে উঠলাম। কাল সকাল হলে বাঁচি, এদের এখানে থাকাও পাপ।

বারান্দা পার হয়ে ঘরের কোলের কাছে আসতেই ওদিক থেকে হাকিম বললেন—ওরে রামনন্দন, নতুন-বাবুর

যদি খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে ত বিছানা করে' দে—বুঝলি।

রামনন্দন উত্তর দিল না, উত্তর দিলাম আমি—বললাম—আজ্ঞে না, থাক্—আমার যা আছে তাইতেই চলে' যাবে!

রাগে অভিমানে ক্ষোভে—আমার ইচ্ছা হচ্ছিল এখনই পালাই। হাকিমের ওই কোদালের মত মুখ আর দেখবার আমার অভিরুচি ছিল না।

ক্রমে রাত্রি হলো। শীতকালের রাত। একে একে মানুষের সাড়া কমে এল। হাকিম ভেতরে ঘুমুতে গেছেন। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আমি নিজের দুরবস্থার কথা ভাবছিলাম।

ঘরের মধ্যে যখন উঠে এলাম, চোখ তখন আমার ঘুমে জড়িয়ে এসেছে কিন্তু খুঁজে দেখি আমার কম্বলখানি নেই। কোথায় গেল? তন্ন তন্ন করে' খুঁজলাম কোথাও পাওয়া গেল না। এই শীতের রাত তবে কাট্‌বে কেমন করে'? কম্বল ছাড়া ত' আমার আর কোন সম্বল নেই! ঘরের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা চাপা দিয়ে আমি আজকের ঠাণ্ডা নিবারণ করি।

এ রাত্রে কাকে ডাক্‌বো? ডাকলে কেউ যে শুনতে পাবে এমন কোনো ভরসা ত নেই! সমস্ত রাত কি আমায় বসে বসে কাটাতে হবে? হা ভগবান!

ঘরের মধ্যে রয়েছে দু একখানি চেয়ার, একটি টেবিল, আর কতকগুলি খবরের কাগজ। আমি আর কোনো উপয়ে না দেখে টেবিলের ওপর উঠে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম। বড় বড় কয়েকখানি খবরের কাগজের পাট্ খুলে' গায়ের ওপর চাপিয়ে দিলাম। কাগজ চাপা দিয়ে শুতে আমি অনেককেই দেখেছি। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাচ্ছিল, পা দুটো কন্ কন্ কচ্ছিল। সেই খবরের কাগজের গাদার তলায় শুয়ে আমি আমার প্রিয়তম কম্বলখানির সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলাম। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়তে পারে না। আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে সে কষ্ট পাচ্ছে তাই ভাবতে ভাবতে আমার চোখে ঘুম এল। পথে-বিপথে, অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে, গাছের তলায়, নদীর ধারে, পাহাড়ের পথে, আমি কম্বলখানিকে অনেক দুঃখ দিয়েছিলাম। আমাকে সে স্নেহ দিয়ে, উত্তাপ দিয়ে অসময়ে ঢেকে রেখেছিল! তার গায়ে ধূলা লেগেছে, কাদা লেগেছে ঝড় লেগেছে,—এতটুকু তার সেবা করিনি! মুখ বুজে সে আমার সকল ত্রুটি সহ্য করেছে। আজ সে যদি আমার ওপর অভিমান করে' চলে' যায় তবে আর কি বলবার আছে?

ঘুমের ঘোরে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। আমার জীবনের অনেক দুঃখ জড়িয়ে ছিল কম্বলখানির মধ্যে, তাই তাকে ভালো বেসেছিলাম !

কিসের শব্দে আমার হাল্কা ঘুম ভেঙে গেল। কাগজের ফুটোর ভেতর দিয়ে দেখলাম, মাথার দিকের দরজাটা ফাঁক হয়ে গেছে আর তারই ভেতর দিয়ে টর্চের আলোর রশ্মি ঘরের মধ্যে ঢুকে কি যেন খুঁজছে ! অবাক হয়ে আমি আর সাড়া দিলাম না, দেখলাম সেই আলোর পাশ দিয়ে একটি লগি-বাঁকারি এসে চেয়ারের উপর থেকে আমার পুঁট্‌লিটি গেঁথে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে ছিল আমার টাকা-কড়ি, আমার পারের খেয়া। তা হোক, আমি স্তম্ভিত হয়ে থাকবো, সে ভালো, কিন্তু সাড়া দিয়ে এই চমৎকার চুরিটিকে ধরে' দিতে পারবো না। শুধু তাকিয়ে দেখলাম, দরজাটার ফাঁক দিয়ে লগি যে বাড়িয়েছে, সে হাকিম। অর্দ্ধেক রাত্রে তাঁর স্থূল দেহের কার্য্যপটুতা দেখে আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে রইলাম। হাকিমকে চুরি করতে দেখবো, এমন সৌভাগ্য ক'জনের আছে ? নিজেদের কাজ শেষ হয়ে গেলে, সেই আলোর রশ্মি একবার আমাকে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি তখন রাশি রাশি খবরের কাগজের তলায় লুকিয়ে শুয়ে আছি।
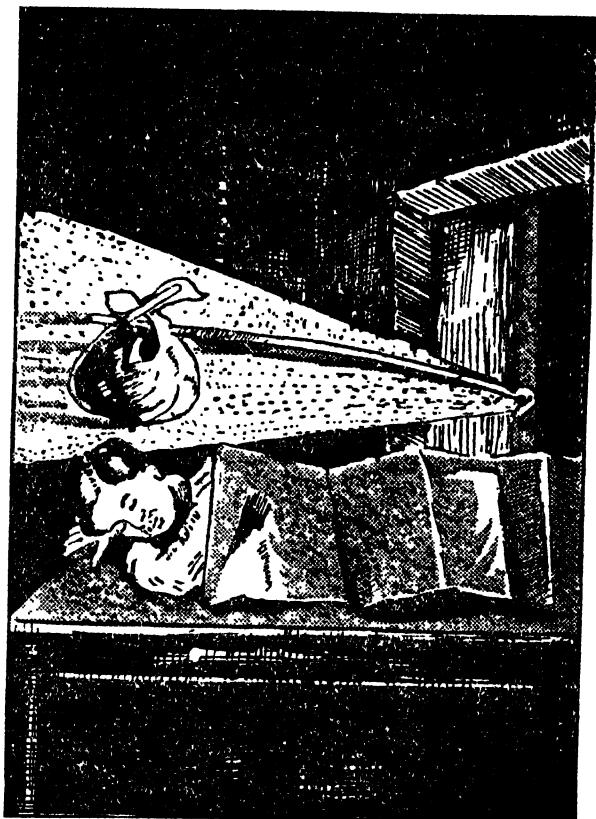
একটি লগি-বাঁকারি এসে চেয়ারের উপর থেকে আমার পুঁটলিটি
গেঁথে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে

সকালে উঠেই আমি বিদায় নিতে গেলাম। আমার কম্বল নেই, পুঁট্‌লিটি নেই, কাছে পয়সা নেই। আমি সর্ব্বস্বান্ত !

জুতো জোড়াটি দরজার বাইরে ছেড়েছিলাম। তার এক পাটি আছে আর এক পাটি কোথায় উধাও হয়ে গেছে, তার আর হদিস নেই। অনেক খুঁজলাম কিন্তু হায় রে, খুঁজলেই কি সব জিনিস পাওয়া যায় ! যাক্ গে। খালি পায়ে হাঁটা অভ্যাস জগতে শুধু আমাদের দেশের লোকেরই।

হাকিম বিদায় দিয়ে বললেন—এদিকে এলে আমার বাড়ীতেই এসে উঠো ভাই। লজ্জা করো না যেন।

যে আজ্ঞে !

রামনন্দন আমার অবস্থা বুঝে আর দেখা করল না। ছেলেপুলেরা আমার কাছে উপহার না পেয়ে এমন সব দৌরাত্ম্য করতে আরম্ভ করল যে এক সময় সবাইকে লুকিয়ে আমি খালি পায়ে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ছুট্‌তে সুরু করলাম।

কিন্তু এ দেশ ত্যাগ করব কেমন করে’ ? ট্যাঁকে যে একটি পয়সাও নেই !

দেখি কি করতে পারি।

———

# চন্দর

ঠাকুর মশাইয়ের সংসারে আপনার লোক বলতে আর কেউ নেই। সে-বার গ্রামে কি একটা মহামারী দেখা দিল, দেখতে দেখতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে ইহলীলা সংবরণ করলে। দুর্ভাগ্য আসে দরিদ্রেরই সংসারে, সুতরাং দুঃখ করবার আর কিছু নেই। আত্মীয় পরিজন সবাই ত গেলই উপরন্তু দেনার দায়ে ঠাকুর মশাইকে বাস্তভিটাটি পর্য্যন্ত মহাজনের হাতে ছেড়ে দিতে হোলো। এবার তিনি পথে বসলেন।

রইল কেবল একজন, সে বাড়ীর পুরানো চাকর। নাম চন্দর। বহুকাল থেকে এই পরিবারে সে মানুষ। লোকটা অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরীহ। তাকে দেখলে মনে হতে পারে জীবনে কোনোদিন সে রাগ করেনি। তার ঠিক বয়সটা অনুমান করা কঠিন, কেউ বলে তিরিশ কেউ বলে পঞ্চাশ। কিন্তু বয়স তার যাই হোক, সে যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং শান্ত। সাত চড়ে রা নেই।

ঠাকুর মশাই বললেন, তোরই মরবার কথা চন্দর, কিন্তু তুই রইলি বেঁচে। আমি এখন তোকে খাওয়াই পরাই কি উপায়ে বল্‌ত ?

সবিনয়ে হেসে হাত দুখানা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে চন্দর বললে, এজ্ঞে, আমি আপনার পায়ের জুতো, কর্ত্তা। আমাকে মারবেন মারুন, কাটবেন কাটুন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

ঠাকুর মশাই বললেন, এখন তবে কি নিয়ে থাকবি, আমি ত আর তোকে আগেকার মতো মাইনে-পত্র দিতে পারবো না ?

চন্দর বললে, আপনার কত খেয়েছি কত নিয়েছি, মাইনে যদি আর না-ই দেন্ তাহলেই কি আর চলে' যেতে পারবো ?

একেবারে প্রভুভক্ত জীব। ঠাকুর মশাইয়ের ব্যবহারের জন্য জল তুলে আনে, পূজোর ফুল তুলে দেয়, অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে প্রভুর পদসেবা করে।

একদিন ঠাকুর মশাই বললেন, হ্যারে চন্দর, আগে তোর যে বদ্ অভ্যেসটা ছিল আজকাল সেটা সেরে গেছে ত ?

চন্দর বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, চুরি ত আর আমি করিনে ? আপনার ঘরে চুরি করলে আমার যে সাত জন্ম নরকবাস হবে ঠাকুর !

ঠাকুর মশাই হেসে বললেন, তোর চুরি বরং সহ্য হবে চন্দর, কিন্তু তুই ধর্ম্মের কথা বলিসনে বাবা।

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, হেঁ হেঁ !

গ্রামে বারোয়ারি তলায় একটি শিবের মন্দির ছিল,

এজ্ঞে আমি আপনার জুতো কর্ত্তা

ঠাকুর মশাই তার পূজারি ! পুরাণো মন্দিরটির পাশের ঘরটিতে তিনি থাকেন, ঘরের আসবাব তাঁর যৎসামান্য—

ঘরের বাইরের জায়গাটুকুতে থাকে চন্দর। ঠাকুর মশাইয়ের মতো সংসারে তারো কেউ নেই। ঠাকুর মশাই রাঁধেন, আর সে তাঁর প্রসাদ পায়।

গ্রামের সেই মহামারীতে অনেক লোকে গ্রাম ছেড়ে নানা দেশে পালিয়েছে, মন্দিরে আর বিশেষ কেউ পূজো দিতে আসে না। নিজেরাই খেতে পায় না, শিব ঠাকুরকে আর খাওয়াবে কেমন ক'রে? মন্দিরের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। ঠাকুর মশাইয়ের দিন চলা ভার। নগদ পয়সাকড়ি ত দূরের কথা, খাবার জিনিসপত্রও আসা বন্ধ হোলো।

ঠাকুর মশাই একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, তুই অপয়া হতভাগা, তোর জন্যেই আমার এত দুঃখ, তুই দূর হরে যা। আমিও চলে যাচ্ছি যে দিকে দু চোখ যায়।

চন্দর বললে, কোথা যাবো কর্ত্তা?

সে আমি কি জানি। আমার সবাই যে চুলোয় গেছে, তুইও যা সেইখানে।

চন্দর বললে, আফিংয়ের পয়সা দিন কর্ত্তা, আমি বিষ খেয়ে মরবো!

ঠাকুর মশাই রাগে একখানা চ্যালা কাঠ নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। বললেন, বেরো হতভাগা!

অতঃপর তিনি এই দুঃখের দেশ ত্যাগ ক'রে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর তিনি কোনোদিন এ গ্রামে ফিরবেন না। ঘরের জিনিসপত্র অতি সামান্য, সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। ঘটি বাটি সব দেনার দায়ে আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ছোট একটি বাক্সে সামান্য ক'খানা কাপড় চাদর ছিল। বাক্সের তালা-চাবি খুলে তিনি দেখলেন, একখানা পুঁথি পড়ে আছে কিন্তু কাপড় চাদরের চিহ্ন মাত্র নেই, কি হোলো ? আবার তিনি বাইরে এসে চন্দরকে ডাকলেন। চন্দর কোথাও যায়নি, ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, হতভাগা, তালা চাবি বন্ধ, ভেতর থেকে কাপড় চোপড় গেল কোথায় ?

চন্দর বললে, তলায় হয়ত ফুটো ছিল, কর্ত্তা।

তাইত, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয়নি, তিনি আবার ঘরে ঢুকে বাক্স পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যই বটে, ছোট্ট একটা ছিদ্র রয়েছে ! ওই ছিদ্র দিয়েই সব বেরিয়ে গেছে।

যাক্ গে, তিনি আবার প্রস্তুত হতে লাগলেন। একটা মাটির হাঁড়িতে অনেকদিন আগেকার গোটাকতক পয়সা জমা ছিল,—শিবের নামের পয়সা,—হাঁড়িটা নাড়াচড়া ক'রে দেখা গেল, পয়সাগুলি নেই। আবার তিনি চীৎকার ক'রে

চন্দরকে ডাকলেন। বললেন, হারামজাদা, চোর আমি হলপ করে বলতে পারি, এ তোর কাজ!

চন্দর জিব কেটে চোখ কপালে তুলে বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, কোথায় রেখেছিলেন পয়সা, কর্ত্তা?

ঠাকুর রাগে হাঁড়িটা তার দিকে গড়িয়ে দিলেন। চন্দর বললে, এই হাঁড়িতে? তবেত হারাবেই কর্ত্তা! এত ইঁদুর বেড়ালের উৎপাত, পয়সা থাকবে কেমন ক'রে?

তা বটে, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয়নি। তাঁর রাগ পড়ে গেল, নিরস্ত হয়ে আবার তিনি বিদেশ যাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

গ্রামের পরে মাঠ, মাঠের পথ দিয়ে কিছুদূর গেলে নদী। সেই নদী পার হয়ে ঠাকুর মশাইয়ের পৈতৃক যজমানদের গ্রাম পড়ে। তিনি স্থির করলেন, যজমানদের কাছে তিনি কিছু কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে তীর্থযাত্রা করবেন। জ্যোতিষ বিদ্যা তাঁর অল্প অল্প জানা ছিল, তাই দিয়ে তিনি দিন যাপন করবেন। সংসারে একজন মানুষের আর ভাবনা কি?

একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে একাকী সেদিন দুপুর রোদে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। মাঠের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখেন, চন্দর।

আবার যে তুই ভূতের মতন পিছু নিয়েছিস?

হাত কচলে চন্দর বললে, এজ্ঞে !

আমাকে তুই ছাড়বিনে হতভাগা ?

এজ্ঞে সে কি কথা

এজ্ঞে, আপনিই কি আমাকে ছাড়তে পারেন ? আমি আপনার পায়ের জুতো যে !

আর কোনো উপায় নেই, অগত্যা ঠাকুর মশাই চন্দরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

নদী পার হয়ে যজমানদের গ্রাম। কিন্তু তারাও দরিদ্র! ঠাকুর মশাই একে একে কয়েকদিন তাদের বাড়ী অতিথি হলেন কিন্তু নগদ বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। লোকে এক মুঠো খেতে দিতে পারে কিন্তু পয়সা কড়ি তাদের কাছে পাওয়া বড়ই কঠিন। ঠাকুর মশাইয়ের ঝুলিতে কয়েকটি মাত্র পয়সা জমা হোলো। একদিন ঝুলিতে সে পয়সাগুলিও খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠাকুর মশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চন্দর তাঁকে পাখার বাতাস ক'রে বললে, কি হোলো কর্ত্তা?

ঠাকুর মশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় গেল পয়সা ক'টা?

চন্দর চুপি চুপি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললে, আমি জানি কর্ত্তা, বলতে সাহস হয় না কিন্তু আমি জানি কে নিয়েছে!

ঠাকুর মশাই দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বললেন, শিগগির বল্ নৈলে তোকে এখুনি ব্রহ্মশাপ দেবো।

হাত যোড় ক'রে চন্দর বললে, রাগ করবেন না কর্ত্তা, এরা সবাই গরীব দুঃখী···আহা! কে নিয়েছেন জানেন,

ওই আপনার যজমান, ওই লম্বা লোকটা—

সে কি, ওই ত দিয়েছিল পয়সা !

সেই কথাই ত বলছি কর্ত্তা, এমনই দিনকাল পড়েছে। গরীবলোক কিনা, দিনের বেলা প্রণামী দিয়ে রাতের বেলা হাত সাফাই ক'রে নেয় !

তা বটে, এই সামান্য কথাটা ঠাকুর মশাইয়ের এতক্ষণ মনেই হয়নি। সত্যিই ত, দিনকাল ভারি খারাপ—বেচারা যজমানের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আর কিন্তু এখানে থাকা ভালো দেখায় না। বললেন, কিছু মনে করিসনে বাবা চন্দর, তোকে অনেক কটু কথা বলেছি। চল্ আজই আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

পরদিন প্রভাতে উঠে চাকর এবং মনিব আবার দেশ-ত্যাগ ক'রে গেলেন। বন পার হতে হোলো, পার হতে হোলো প্রান্তর, ছোট ছোট নদী ও খাল, তারপর গ্রাম, গ্রাম পার হয়ে দুজনকে আসতে হোলো ইস্‌লামপুর রেল ষ্টেশনে।

গাড়ী ভাড়া নেই সুতরাং ষ্টেশনের ধারে ঝুলি এলিয়ে ঠাকুর মশাই জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুঁথি খুলে পথে বসে গেলেন। একটু দূরে চন্দর হাত জোড় ক'রে ব'সে গেল ভক্ত হনুমানের মতো।

হ্যাঁ, বেশ কিছু রোজগার হোলো বটে। ঠাকুর মশাই অনেক পথিকের হাত দেখে দেখে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দিলেন। অনেকে খুসি হয়ে পয়সা দিয়ে গেল। চন্দর হাত জোড় ক'রে চক্ষু বুজে ভক্তি গদগদচিত্তে বসে রইল, পয়সার শব্দ হোলেই কেবল সে এক একবার মিট মিট ক'রে তাকাচ্ছিল।

দিন তিনেক কাটলো সেই ষ্টেশনের ধারে। কিছু পয়সা জমিয়ে ঠাকুর মশাই তাঁর অনুগত ভৃত্যটিকে নিয়ে সেদিন সকাল বেলায় শহরগামী একখানা ট্রেণে চড়ে বসলেন। বললেন, নিজের কপাল যেমনই হোক, পরের কপাল নিয়ে মাথা ঘামালে কপাল কিছু ফিরে যায়, বুঝলি বাবা ?

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, তাইত, এজ্ঞে !

ঠাকুর মশাই চলন্ত ট্রেণের ভিতরে ব'সে খুসি মনে অনেক কথা ব'লে গেলেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করবার পূর্ব্বে পয়সার থলিটা বা'র ক'রে বললেন, চন্দর, তুই আমার বড় বিশ্বাসী বাবা, এই নে, রাখ্‌, পয়সা কড়ি এবার থেকে তোরই কাছে থাকবে। ওসব আমি সামলাতে পারিনে।—পয়সার থলিটা তিনি চন্দরের হাতে গুঁজে দিলেন।

আজ চন্দর স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে অনুগত ভৃত্য, সে সেবক, কিন্তু বিশ্বাসী সে নয়। জীবনে কোনোদিন পয়সার থলি হাতে দিয়ে কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি। ঠাকুর মশাইয়ের ঘরে যত চুরি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে, সবই তার কাজ। সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, সে অবিশ্বাসী,—নিজের অসৎ স্বভাবের জন্য কোনোদিন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম অনুতাপে তার চোখে জল এসে দাঁড়ালো। এই বিশ্বাসের ভার সে বইবে কেমন করে? কেমন ক'রে বইবে সে স্নেহের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান?

কিন্তু তার মুখে আর একটি কথাও ফুটলো না। কেবল নিঃশব্দে ঠাকুর মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে সে নীরবে জান্‌লার বাইরে প্রশান্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

# অদল-বদল

সামন্ত আসছিল ট্রেনে—গয়া থেকে কল্‌কাতার পথে। সেটা শীতকালের শেষ। সন্ধ্যার সময় ট্রেন ছেড়েছে, সকালে এসে পৌঁছবে কল্‌কাতায়।

ভিড় হয়েছে খুব, তবু শোবার একটু জায়গা সামন্ত অতি কষ্টে সংগ্রহ ক'রে নিল। তার একটা বদ অভ্যাস ছিল, রাতে সে ঘুমোয়; আর একটা বদ অভ্যাস ক্ষুধা পেলেই সে খায়।

ট্রেন ছাড়বার পরে দেখা গেল, একজন চেকার একটি লোককে লাঞ্ছনা করছে, লোকটা বিনা টিকেটে গয়া থেকে উঠেছে, সঙ্গে তার একটা ঝুলি ছাড়া আর কিছু নেই। সে কী লাঞ্ছনা! কিন্তু লোকটি কিছুই কথা বলছে না, মুখ বুজে উদাসীন হয়ে সব সহ্য করে যাচ্ছে, সে যেন পাথর। বয়স তার তিরিশ কি চল্লিশ বুঝবার উপায় নেই, ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁক্‌ড়া মাথার চুল, টক্‌টকে রং,—ভয়ানক বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু তার সে চেহারার কোনো দাম নেই, সে-দেহ যেন মাটির স্তূপ। সামন্ত নীরবে বসে রইলো।

প্রথম ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামতেই চেকার-সাহেব লোকটাকে ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল; চুলের

মুঠি ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে আনল। দরজার কাছে এনে নিতান্তই যখন বাইরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলো,

চুলের মুঠি ধরে হিড়্ হিড়্ করে……

সামন্ত আর থাকতে পারলো না। উঠে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবারটা ওকে ছেড়ে দিন, আমি ওর ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। কত ভাড়া নিতে চান্ ওর কাছে ?'

অপ্রত্যাশিত দয়া, অকারণ অনুগ্রহ ; সবাই সবাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।. চেকার-সাহেব হিসেব ক'রে বল্‌লে, জরিমানা সমেত ছ' টাকা পেলে ওকে ছেড়ে দিতে পারি মশাই।

তথাস্তু। সামন্ত ছ' টাকা বা'র করে দিয়ে হাওড়া পর্য্যন্ত যাবার একটা ছাড়পত্র নিলে লোকটার জন্য। চেকার-সাহেব খুসি হয়ে নেমে গেল। লোকটি তখন কৃতার্থ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিনয়ে জানালো, 'কী উপকারই করলেন আপনি, আমি আপনার পায়ের জুতো। দেখচেন, ত যোগী ফকির মানুষ আমি, টাকা-পয়সা পাবো কোথায় ?'

সামন্ত বললে, 'তা' বলে কি আর কেউ অমনি গাড়ী চড়তে দেয়, এই দিনকাল—'

লোকটা বলতে লাগলো, 'আমার নাম পণ্ডিত, বাড়ী আমার গুজরাটে। আমি নিজে সন্নিসী বাবু, কিন্তু আমার অবস্থা এমন নয় ; অনেক বিষয় সম্পত্তি, সব ছেড়ে এসেছি। ওসব মায়া, মোহ ; সংসার মিথ্যে। ভগবানকে পাওয়া চাই।'

সামন্ত খুসি হলো, পরম ভক্তিতে পণ্ডিতের কথাগুলি শুনতে লাগলো। বাস্তবিক, এমন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী সে জীবনে দেখে নাই।

'আমি বাবু এখন আসছি কুরুক্ষেত্র থেকে, সূর্য্যগ্রহণের মেলা ছিল।—' পণ্ডিত বলে যাচ্ছিল, 'আসতে একমাস লাগলো, গাড়ীতে উঠি আর নামিয়ে দেয়, পয়সা-কড়ি নেই সঙ্গে, উপবাসেই দিন কাটে। আপনার পুঁট্লিতে কি আছে বাবু?" —বলে সে নিজেই সামন্তর একটা পুঁট্লি খুলতে লাগলো।

সামন্তর রাতের খাবার ছিল পুঁট্লিতে; পণ্ডিত তার: অনুমতি না নিয়েই গরম-গরম পুরি খেতে আরম্ভ ক'রে দিল। বল্লে 'আপনারা বড়লোক মানুষ, এসব জিনিস কি আর খেতেন? হয়ত নষ্টই হোতো, ফেলা যেত সব। বাঃ, সন্দেশও দুটো আছে দেখছি; আঃ, বাঁচলাম।'

সামন্ত চুপ করে রইলো। পরমানন্দে আহারাদি শেষ করে এক সময় পণ্ডিত বল্লে, 'আপনি গাঁজা খান্ বাবু?'

সামন্ত বল্লে, 'না। ওসব খেতে নেই।'

'তবে কি খান্? সিগারেট? দিন্ ত একটা—'

সামন্ত পকেট থেকে সিগারেটের একটা নতুন প্যাকেট বার করতেই পণ্ডিত সেটা তার হাত থেকে তুলে নিলে, এবং নিজের মনে চার-পাঁচটা সিগারেট্ বা'র ক'রে বল্লে, 'এই স্বদেশীর দিনে এসব বিলিতি সিগারেট্ খাওয়া উচিত নয়'—

ব'লে একটা সে ধরালো, এবং বাকি তিন-চারটে সে নিজের ঝুলির মধ্যে যত্ন ক'রে রেখে দিল !

সামন্ত এবার মুগ্ধ হয়ে গেল ! এমন সরল, এমন নির্লিপ্ত, এমন স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ সে আর কবে দেখেছে ? পরের বস্তুকে যে নিজের মতো ক'রে দেখে, সে ত মায়া ও মোহের অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছে ! সামন্ত গদগদ হয়ে তার পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিল। বল্‌লে 'ঠাকুর, প্রথমটা তোমাকে বুঝতে পারিনি, আমি বড় অধম।'

পণ্ডিত খুসি হয়ে গেল। বল্‌লে, 'হাঁ, আমিও তোকে পরীক্ষা করছিলাম। তুই বেটা বড় ভক্ত ! তুই পাবি ভগওয়ানকে।'

আনন্দে সামন্তর চোখে জল দেখা দিল। অনেক পুণ্যফলে সে আজ এমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। বললে, 'ঠাকুর, আমি তোমার কি উপকার করতে পারি বলে দাও। আবার কবে কোথায় তোমার দেখা পাবো ?'

পণ্ডিত একটু হেসে সামন্তর বিছানাটার মাঝখানে চেপে বসলো। তারপর বললে, 'ভক্তি রাখ্ মনে, আবার একদিন দেখা পাবি। পরের অনিষ্ট কখনো করবিনে, মন্দ কথা কখনো ভাববিনে।'

নিজের শোবার জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়ে সামন্ত পণ্ডিতের

পায়ের কাছে করজোড়ে বসে রইলো; সে ভুলে গেল খাওয়ার কথা, ভুলে গেল রাতে ঘুমোবার কথা। পণ্ডিতের মোটা-মোটা দু'খানা কদাকার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বল্‌লে, 'আমি তোমার দাসানুদাস, গুরুদেব।'

আমি তোমার দাসানুদাস গুরুদেব

পণ্ডিত বল্‌লে, 'তোর বিলাসিতা খুব বেশী দেখছি, এখনো তোর দেরি আছে। পায়ে এমন ভালো চক্‌চকে জুতো পরেছিস, এর কত দাম?'

সামন্ত বল্লে, 'দশ টাকা।'

'দশ টাকা? বেটা, এই টাকায় যে একজন দরিদ্র পরিবারের এক মাসের খাই-খরচ চলে?'

সামন্ত বললে, 'অপরাধ হয়েছে ঠাকুর, এবার থেকে বিলাসিতা ত্যাগ করবো। আমি কখনো সদ্‌গুরুর সঙ্গ পাইনি, তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।'

পণ্ডিত অর্দ্ধমুদিত চক্ষে বসে রইলো। সামন্ত ভাবতে লাগলো, সে আর বাড়ী ফিরে না গেলেও পারে, এই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে যদি সে নিরুদ্দেশের পথে বা'র হয়, তবেই হয়ত পরকালে তার মোক্ষলাভ ঘট্‌তে পারে। ওদিকে রাত হয়েছে গভীর, গম্‌গম্ ক'রে ট্রেণ ছুটছে, গাড়ীর ভিতরে আর বিশেষ কেউ জেগে নেই; কেবল একজন হিন্দুস্থানী তখনো ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে গান গাচ্ছিল।

পণ্ডিত এক সময় বল্লে, 'আমার কাছে যে আসবে তাকে আসতে হবে সব ছেড়ে দিয়ে। তোকে এসব ত্যাগ করতে হবে বেটা,—এই জামা কাপড়, জুতো, সোনার বোতাম, আংটি—'

সামন্ত বল্লে, 'আমি এখুনি রাজি গুরুদেব।'—বলেই সে বাক্স থেকে একখানা পুরোণো কাপড় আর একটা জামা বা'র ক'রে পরণের দামি কাপড় জামাগুলো ছেড়ে ফেললে।

তার সঙ্গে ছিল ছোট একটা স্যুট্‌কেশ, তার ভিতরে সবগুলে সে রাখলো, জুতোটা পর্য্যন্ত। পকেটে মণিব্যাগে ছিল একতাড়া টাকার নোট্‌, মণিব্যাগটাও সে স্যুট্‌কেশের মধ্যে ফেলে রাখলো। তারপর ছুটো বেঞ্চের মাঝখানে

স্যুটকেশটা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে হাঁ করে রয়েছে

অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে বসে আবার সে পণ্ডিতের শ্রীচরণের সেবা করতে লাগলো। বা'র বা'র সেই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলো, 'আজ থেকে আমি সব ত্যাগ করলুম, আমাকে তোমার পায়ে রাখো ঠাকুর, আমাকে দীক্ষা দাও।'

পণ্ডিত তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লে, 'কল্যাণ হোক।'

একান্ত অনুগত ভক্তের মতো বসে বসে সামন্ত নিজের প্রার্থনা জানাতে লাগলো। তারপর চল্‌লো কত গাল-গল্প ; সামন্তর যেন নেশা ধরে গিয়েছে। বাস্তবিক, সৎসঙ্গ পেলে মানুষ প্রথমটা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু মানুষের শরীর ত বটে, এক সময় দুজনের চক্ষেই ঘুম এলো ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা সামন্তর আর নেই। অল্প সেই জায়গাটুকুতে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কাঠের দেয়ালে মাথা রেখে সে শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়েই পড়লো। পণ্ডিতের তখন গাঁ গাঁ ক'রে নাক ডাক্‌ছে। আহা, কী নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী !

সকাল বেলায় যখন সামন্তর ঘুম ভাঙলো, গাড়ী তখন হাওড়া ষ্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমটি হয়েছে তার। কিন্তু উঠে বসেই তার চোখের নেশা ছুটে গেল ; দেখলো, তার সর্ব্বাঙ্গে একখানা গেরুয়া কাপড় ঢাকা, তার উপরে একখানা ছেঁড়া কম্বল। দুর্গন্ধময় গেরুয়া কাপড়খানা মুখের উপর থেকে সরিয়ে সে উঠে বসলো। দেখে, রাত শ্রীগুরুদেব পণ্ডিত মশাই অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে একেবারে

স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার স্যুটকেশের একি অবস্থা? কাপড়, জামা, জুতো, আংটি, মণিব্যাগ—কিছুই নেই! স্যুটকেশটা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে হাঁ ক'রে রয়েছে।

গেরুয়া কাপড়খানা ও কম্বলটার দিকে সামন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালো! লোকটা বেশ বাবু সেজেই পালিয়েছে, বর্দ্ধমানে, কি লিলুয়ায়, কি কোথায় নেমে গেছে কে বলতে পারে। সামন্ত একেবারে সর্ব্বস্বান্ত!

# ডাক্তারের সাহস

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কল্‌কাতার উত্তরে মাইল দুই গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর বাসে যাওয়া যায়, আগে যেতে হোতো হেঁটে কিম্বা 'শেয়ারের' গাড়ীতে। শেয়ারের গাড়ী ছাড়ত কোম্পানীর বাগানের মোড় থেকে, এক একজনের চার আনা ভাড়া। কল্‌কাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কল্‌কারখানা, মুটে মজুর, দোকান বাজার, পাট আর ভুষিমালের আড়ৎ—এই সবের ভিড় ছিল বেশি। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হৈ চৈ, গরুর গাড়ীর দল, জনমজুরের হল্লা, মালগাড়ীর আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত লেগে থাকৃত, কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই তাদের আর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, পথ হয়ে যেত নির্জ্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না, মাঝে মাঝে এক আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চ'লে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেক দিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা ষ্টীমারে কল্‌কাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ী অনেকদিন থেকে প'ড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ীর ধার দিয়ে সন্ধ্যার পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিৎ মনে করতেন না। বাড়ীটা এখানকার পূর্ব্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্য্যও নেই, কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে—কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ীটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ, বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি ; শুধু তাই নয়, লোকের বিশ্বাস এ বাড়ীতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি এ বাড়ীতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ীর অন্দর মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে

ভূতকে ও পাড়ার লোক বেশি মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হ'লে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যেদের জামাই এ সব আজগুবী কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তার বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার ক'রে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষ্যে তিনি শ্বশুরবাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন! এ পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোকরাদের দলে তাঁর নাম ডাক খুব। একদিন ভূতের বাড়ীর আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন, যদি একটা রাত আমি ওবাড়ীতে কাটিয়ে আসতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে ?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে, একটা রাত ? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু ? দু ঘণ্টার বেশি যদি আপনি থাকতে পারেন তবে কি বলেছি।

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন, কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে, বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হোলো না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন, অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও বাড়ীতে যেয়ো না বাবা। একটা ভালো মন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললে, আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

আমাদের কথা তবে শুন্‌বে না?

আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ীর সকলে কান্নাকাটি ক'রে অস্থির। এমন সর্ব্বনেশে ডাকাত জামাই তাদের না হলেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললে, আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন্ তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললেন, বাঁচলে ত সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক্ বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলে না। তার বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি—তার ভয় কি?

সকলের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে সে প্রস্তুত হ[illegible] লাগল।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যাণ্ট প'রে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চ্চটা পরীক্ষা ক'রে হেসে বললে; রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সোরগোল ক'রে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিতরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখে এল। শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হোলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবলের ওপর, একটা জলের কুঁজো আর কাঁচের গ্লাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমী— চিরবিশ্বস্ত টমী ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে এক সঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ীর ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনোদিকে তাকাতে সাহস করলে না পাছে কিছু বিভীষিকা তাদের চোখে প'ড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্ব্বাসিত হয়ে রইল, এবং তার ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা জান্‌লা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ ক'রে দিল। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারিদিক নিশব্দ, নিঃস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তাঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্ম্মকোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারি হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেনি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্ব্বলতা। মনে হোলো ঘড়িটায় যেন আরো একটু আস্তে শব্দ হ'লে ভালো হয়। ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর ব'সে ডাক্তার একবার এদিক ওদিক তাকালে। দেয়ালগুলো জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁজিবুঁজি কাটা,—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালে। না, কেউ নয়,

বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়, বোধ হয় কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন্ দিকে? জান্‌লায় না দরজায়?

খট্ খট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমী মুখ তুলে তাকালে। একবার সে একটু গোঁ গোঁ ক'রে উঠ্‌ল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয় বাতাস। পুরনো দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈ কি। টমী তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নীচু ক'রে প'ড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিয়ে দেখ্‌ল তার বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্ত্তৃত্ব সে হারিয়ে ফেল্‌ছে। তবু, অনেক চেষ্টায় সে গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক টিক করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের গায়ে। ওকি? দেয়ালের সেই

আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু ক'রে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসবে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু হাত উঠ্‌ল না। কই, বন্দূকটা ত তার কাছে নেই? কে নিলে। গলা—ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরছে! স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিশ্বাস নেই। সে নড়লার চেষ্টা করলে কিন্তু সম্ভব হোলো না, খাটের সঙ্গে তাকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারায়নি, খুব সাহসী লোক সে। চেয়ে দেখ্‌ল, আশ্চর্য্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে, কাঁচের গেলাসটা দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছে। ভয়ে তার রোমকূপগুলো আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল।

খট্‌ খট্‌ খট্‌—

কিসের শব্দ? কই, টমী ত আর গোঁ গোঁ ক'রে

উঠ্‌ল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমীর গায়ে একটা চিম্‌টি কাট্‌ল; এত জোরে যে, টমীর গায়ের মাংস খানিকটা তার আঙ্গুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই, টমী ত জাগ্‌ল না? তবে? তবে? বেঁচে আছে ত? টমী বেঁচে নেই, তার নিশ্বাস পড়ছে না, তার সর্ব্বশরীরে এক বিন্দু প্রাণ নেই, ম'রে সে কাঠের মতো প'ড়ে রয়েছে। এপাশে বন্দুক নেই, ওপাশে টমী নেই।

ঘড়িটায় আর টিক টিক শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবল্‌টা এইবার নড়ে উঠ্‌ল, চারটে পায়া ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমী, টমী? টমী বেঁচে নেই, বাঁ হাতের কাছে তার মৃত দেহ, অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাঁচের গ্লাসটা উড়ছে, টেবল্‌টা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তার দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা জানলাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠ্‌ল। কা'রা ঢুক্‌ছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়, এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন

পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুট্‌ছে। কে তাকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। সে কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলে পারলে না। গলা তার বন্ধ, হাত পা বন্দী, চোখ ছুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তার মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তার বুকের ওপর চেপে বসেছে তাকে নড়তে দিলে না। খাটখানা দেখতে দেখতে তাকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমী, টমী? টমী ম'রে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমীর মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমী নখর বিস্তার ক'রে তার দিকে মুখব্যাদান ক'রে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমী-দানব হেসে উঠ্‌ল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো—আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাকে নিয়ে যাবে, ভূত প্রেতের রহস্যরাজ্যে। ঊর্দ্ধদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে, অতি দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খ'সে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছে, হয়ত কোনো মহাসমুদ্রের জলে সে আছাড় খেয়ে প'ড়ে তলিয়ে যাবে। গেল, গেল—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জান্‌লা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে! সর্ব্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে।

দরজা খুলুন্ ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেব্‌ল, কুঁজো ও গ্লাস, তার বন্দুক আর টমী। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন, যাই হে, দাঁড়াও।

---

# ভোটরঙ্গ

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচন,—চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। শহরের নাড়ি দ্রুত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাস্ ছুটছে, মোটর ছুটছে, ঘোড়ার গাড়ী ছুটছে,—হাজার হাজার ক্যান্‌ভাসারের দল প্রাণের দায়ে আপন আপন প্রভুর ভোটের জন্য ছুটোছুটি করছে। বেকারের দল কাজ পেয়েছে, পয়সা পাচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে শ্মশানে বাজারে লক্ষ লক্ষ প্লাকার্ড্ পড়েছে,—অমুককে ভোট দিন্। অমুক আপনার শ্রীচরণের সেবক, মনে রাখবেন। অমুক আপনার দাসানুদাস, ভোলেন-নি ত? অমুককে ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে বাঁচান্। অমুককে ভোট দিয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ করুন—ইত্যাদি। মোটরের পিছনে, বাসের পিছনে, গাড়ীর পিছনে নানান্ জাতের পোষ্টার লাগানো। কেবল, ভোট দাও, ভোট দাও। কেউ গাড়ী চাপা গেল, কেউ মারামারি বাধালো, কেউ ধরা পড়ল পুলিশে, কেউ বা কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে বসলো। বাস্তবিক, এই সময়টায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের মধ্যে যে পরিমাণ জাল জোচ্চুরি, মিথ্যাকথা, ধাপ্পাবাজি, স্বার্থপরতা, হিংসা দেখা যাচ্ছে এমন আর কখনো দেখা য়ায় না।

'মশাই, অমুক লোকটা অমুক লোকটাকে নিশ্চয় হারিয়ে দেবে, কি বলেন ?'

'আপনি অমুককে ভোট দিচ্ছেন ত ? নিশ্চয়ই দেবেন, উনি খুব জনপ্রিয়।'

'অমুককে কদাচ ভোট দেবেন না, দেশের শত্রুতা করা হয়! জানেন ত, লোকটা গোপনে গভর্ণমেণ্টের টাকা খায় ?'

'আপনার পায়ে পড়ি মশাই, রসিক চৌধুরীকে দয়া ক'রে একটি ভোট্ দিন্, তিনি আপনার পায়ের জুতো।'

'কই, তাঁর নাম শুনিনি ত ?'

'শোনেন-নি ? আশ্চর্য্য, অবাক্ করলেন আপনি! আপনি বাংলা দেশে বাস করেন ত ? অথচ তাঁর নামটা আপনার কানে ওঠেনি ? অত বড় বড় দুটো কান আপনার! আশ্চর্য্য, রসিক চৌধুরী দেশের এত বড় একটা মাথা, চিরকাল নিঃশব্দে দেশের কাজ ক'রে এল, সর্ব্বস্ব যে আপনাদের জন্য বিসর্জ্জন দিলে, আজ তার নামটাও ভুলে যান্ আপনারা ? হায় পরাধীন জাতি, হায় দেশ···দয়া ক'রে তাঁর নামে ভোটটা দেবেন ত ?

কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভোট, ভোট, ভোট। সিনেমায় ভোট, রেডিয়োতে ভোট, খেলার মাঠে ভোট।

শেষকালে ভোট-ক্যানভাসারের দল দেখলেই লোকেরা ছুটে পালাতে লাগল, পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে গৃহস্থরা বাড়ীর দরজা বন্ধ করতে সুরু করল। ইন্‌স্যুয়রেন্স্ ক্যান্‌ভাসার আর ভোট ক্যান্‌ভাসার—এদের দৌরাত্ম্যে কল্‌কাতায় আর বাস কর্‌বার উপায় নেই।

আমাদের পাড়া থেকে রসিক চৌধুরী মশাই এবারে কাউন্সিলর হবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কাগজে কাগজে তাঁর বিজ্ঞাপন, বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে তাঁর গুণগান। তিনি যে এত বড় একজন দেশহিতৈষী এবং সমাজসেবক এর আগে কেউ জান্‌ত না। লোকটার অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। হঠাৎ সখ হোলো, তিনি কাউন্সিলর হবেন। পাড়ায় পাড়ায় খবর পৌঁছলো, অনেকগুলি বেকার ছোকরা তাঁর জন্য ভোট আদায় করতে বেরুলো। রসিকবাবু খান চারেক ভাড়াটে মোটর আনালেন। ঘুষ এবং তোষামোদের দ্বারায় অনেক মুরুব্বি জোগাড় করলেন। নিজে হাতযোড় ক'রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে বেরুলেন। তিনি যে এমন সদালাপী, সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক একথা কি এর আগে এমন ক'রে কেউ জান্‌ত ? এই সুযোগে অনেকে তাঁকে ভোট দেবার নাম ক'রে কিছু কিছু টাকা আদায় করতে লাগল। তিনি সবিনয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলেন, আমার যথাসর্ব্বস্ব ত

আপনাদেরই জন্যে ! আমি আপনাদের গোলাম !

এই গোলামটি আগে সাহেব সেজে সকলের উপরে টেক্কা দিয়ে বেড়াত, কিন্তু লোকটার ভালমানুষী দেখে অনেকেই বললে, আচ্ছা আপনাকেই ভোট দেবো।

হাতে যে কয়েকদিন সময় ছিল তা ক্যান্‌ভাস্‌ করতে করতেই খরচ হয়ে গেল। আগামী কাল ভোট গণনার দিন। রসিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন রতন পাল। একই জায়গা থেকে এই দুটি লোক পাল্লা দিচ্ছেন। রতন পালের অবস্থা খুব ভালো, পাটের দালালিতে বড়লোক, অনেক টাকা, অনেক ক্যান্‌ভাসার, অনেকগুলি মোটর। লোকটা ঘুষ ছড়িয়েছে চারিদিকে। একজন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতাকে ঘুষ খাইয়ে প্রশংসাপত্র আদায় করেছে। বহু লোকের ভোট সে পাবে। তার ক্যান্‌ভাসাররা চীৎকার করতে করতে মোটর ছুটিয়ে যায়, তার নামে পাড়ায় পাড়ায় গানের দল, কাগজে কাগজে তার ছবি।

এদিকে রসিক চৌধুরীও বেশ খরচ করছেন। ব্যাঙ্কে তাঁর কিছু টাকা ছিল, সেটা তুলে আনিয়েছেন, বাড়ীখানা এক মাড়োয়ারির কাছে বন্ধক রেখে মোটা টাকা ধার করেছেন—ওই রতন পাল, পাটের দালাল, ওটাকে

হারাতেই হবে। রসিকচন্দ্র তাঁর ক্যান্‌ভাসারের দলকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে বিরাট ভোজের উৎসব লাগিয়ে দিলেন। বাড়ীতে যেন ভূতের উপদ্রব স্থরু হয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরে তিনিও খবরের কাগজওলাদের ঘুষ পাঠাচ্ছিলেন। বড় বড় ছবি তাঁর ছাপা হয়েছে, বড় বড় অক্ষরে প্রশংসা! দেশের লোক স্তম্ভিত হয়ে যেতে লাগল, তারা জানৃত না বাংলা দেশে এতগুলি মহৎ ব্যক্তি রয়েছেন।

পাড়ায় হৈ চৈ কাণ্ড। গৃহস্থদের চোখে ঘুম নেই। রতন পালের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে রসিক চৌধুরীর বাড়ীর মেয়েদের ঝগড়া বাধল। এ-বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে ও-বাড়ীর পুরুষদের মারামারি লেগে গেল। ও-বাড়ীর একটা ছোট ছেলে এ-বাড়ীর একটা ছেলেকে ঢিল ছুঁড়ে মারল। রসিক চৌধুরী পুলিশ ডাকতে ছুটলেন, কিন্তু রতন পালের কারসাজিতে পুলিশ আর এসে পৌঁছল না। ক্যান্‌ভাসাররা খুব চালাক লোক, তারা এই স্থযোগে দুই পক্ষ থেকেই টাকা আদায় করতে লাগল। রসিক চৌধুরীর লোক গিয়ে গোপনে টাকা খেয়ে রতন পালের কাজ করতে লাগল এবং রতন পালের ক্যান্‌ভাসাররা গোপনে রসিকের কাছে টাকা নিয়ে রতন পালের শত্রুতা করতে লেগে গেল।

কে হারে কে জেতে—এই নিয়ে জটলা, এই নিয়ে আন্দোলন। পাড়ায় চায়ের দোকানটার অবস্থা ফিরে গেল, খাবারের দোকানটা ফেঁপে উঠ্‌ল, মোটরওয়ালারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে লাগল। ভিখারীরা পয়সা পেয়ে রসিক চৌধুরীর নামে ছড়া বেঁধে চারিদিকে প্রচার করতে লাগল। কেউ চীৎকার করছে, রসিক চৌধুরী কী জয়! কেউ বলছে, ভোট ফর্‌ রতন পাল—হিপ হিপ হুররে! বন্দে মাতরম্‌, মহাত্মা গান্ধী কী জয়!

আশ্চর্য্য রতন পালের কাণ্ড কারখানা। তার পক্ষ থেকে অদ্ভুত ভাবে প্রচার কার্য্য করা হয়েছে। সকলের মুখেই 'রতন পাল।' সম্ভবতঃ সে-ই বেশি ভোট পাবে। লোকটা অগাধ টাকা খরচ করেছে। পাটের দালালের পাটোয়ারি বুদ্ধির কাছে রসিক চৌধুরী হার মান্‌ল। হে ভগবান, তুমি রক্ষা করো। লোকটা যেন আজ রাত্রেই ওলাউঠায় মারা যায়।

কিন্তু রতন পালকে মারে কা'র সাধ্য! তার বাড়ীর চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। তার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক জগতে আর কেউ নেই। বহু গৃহস্থকে সে টাকা দিয়ে বশ করেছে। সে সব লোক কি আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে? রতন পাল এক এক পরিবারের সকলের পায়ের

জুতো কিনে দিয়েছে। বলেছে, ওই জুতো আমার গায়ের চামড়ায় তৈরী, তোমরা আমায় পায়ে রেখো বাবা।

রসিক চৌধুরী পাগলের মতো আলুথালু হয়ে ছুটছে। তার স্নানাহার বন্ধ। এইবার তার বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়বে। আর বুঝি তার জয় হোলো না। তার যথাসর্ব্বস্ব গেছে, নগদ টাকা আর নেই। বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বন্ধ। আগামী কাল ভোট গণনা হবে। তার পক্ষের অবস্থা খুব খারাপ। রতন পাল জিতলে সে আর সংসারে থাকবে না, গেরুয়া চড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে যাবে। সে বিষ খাবে, গলায় দড়ি দেবে, জলে ডুবে মরবে, ট্রেণের লাইনে গলা পেতে দেবে, নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলবে।

ভয়ে তার সন্ধ্যাবেলায় জ্বর এলো, চোখ লাল হোলো, তবু তার পায়চারি থামল না। লোকজন তার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করছে, ঢ্যাঁড়া পিটোচ্ছে, চীৎকার করছে, ভোটারদের পায়ে গিয়ে শুয়ে পড়ছে। পথের লোক ধ'রে কান্নাকাটি লাগিয়েছে। তবু আর আশা নেই, রতন পালের পক্ষে অনেক বেশি ভোট, তার কানে সন্ধ্যার পর খবর এলো। এবার নিশ্চিত অধঃপতন, নিশ্চিত মৃত্যু। এ সংসার বড় নিষ্ঠুর, মানুষ বড় কুটিল। এ জগতে সে আর থাকবে না।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দল এলো, তারা খোল-করতাল বাজাতে লাগল। প্রার্থনা করতে লাগল, যেন, রসিক চৌধুরীর জয় হয়। কি আবার রাত্রে কানে খবর এল, জয়ের আশা নেই। রসিকচন্দ্র হাতের কাছে আর কিছু পেলেন না, গৃহিণীর কাছে গহনাগুলি চেয়ে নিলেন। অনেক টাকার গহনা, সোনার দর চড়েছে, অতএব তৎক্ষণাৎ সেগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে লোক পাঠালেন।

টাকা এলো। রসিকচন্দ্র ক্যানভাসারদের মধ্যে আবার টাকাগুলি মুড়ি-মুড়কির মতো ছড়িয়ে দিলেন। আর টাকা নেই, শেষ পুঁজি খরচ হয়ে গেল।

সমস্ত রাত প্রলাপ ব'কে কেটে গেল। বেহুঁস জ্বর। পরণের কাপড় চোপড়ের ঠিক নেই। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। এক জায়গায় শুতে পাচ্ছেন না, অস্থির হয়ে সারা বাড়ীময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। সকাল বেলা তাঁর কাছে আবার খবর এলো, ভাগ্য বিরূপ, এত ক'রেও জয়ের আশা নেই। পাটের দালালের কাছে ব্রাহ্মণ সন্তানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

তাইত, দেশে কি ধর্ম্ম নেই? দেশে কি জীবে দয়া নেই? ব্রাহ্মণত্ব কি একেবারে লোপ পেয়েছে? রসিক

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেন। আজ তিনি চোখের আগুনে সবাইকে ধ্বংস ক'রে দেবেন।

পাড়ায় চারিদিকে তাঁকে বিদ্রূপ ক'রে চীৎকার উঠ্‌ল, জয়, রতন পাল কী জয়!

পাগল করবে এরা, এরা অপমান করবে। অসহ্য, অসহ্য। পরাজয়ের কলঙ্ক, পরাজয়ের লজ্জা। ভোট গণনার আগেই তিনি বিষ খাবেন। মরবার সময় ব'লে যাবেন, রতন পালের লোক তাঁকে বিষ খাইয়েছে। রতন পালকে যেন পুলিশে গ্রেপ্তার করে।

আবার চীৎকার উঠ্‌ল, রতন পাল কী জয়! আর মাত্র ঘণ্টা দুই বাকি। রসিক চৌধুরী মরিয়া হয়ে তাঁর উড়িয়া চাকরকে ডাকলেন, জগবন্ধু?

জগবন্ধু এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, গোয়াল থেকে শাদা গরুটা বার কর ত বাবা?

জগবন্ধু গিয়ে গোয়াল থেকে শাদা গরুটার দড়ি ধরে বের ক'রে নিয়ে এলো। গরুটা ভয়ানক দুরন্ত। শিং নাড়া দিতে লাগল।

বাড়ীর একটা ছেলেকে রসিক বললেন, ওরে কেষ্টা, আল্‌কাৎরা দিয়ে গরুটার গায়ে লেখ্‌, আমি যা বলি।

তথাস্তু। আল্‌কাৎরা এনে গরুর গায়ে লেখা হোলো,

'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্'। তারপর সকলের মাঝখান দিয়ে দড়ি ধ'রে গরুটাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পথের ভিড়ের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হোলো।

দুষ্ট দুরন্ত গরু, লোকজন দেখে ভয়ে পা তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটলো। তার বাঁকা শিং দেখে রাস্তার লোকজন চীৎকার করতে করতে কে কোথায় কা'র ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাতে লাগল তার ঠিক নেই। কিন্তু গরুর গায়ের লেখাটা সবাই একবার ক'রে পড়লো, 'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্'। গরুটা দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে হাম্বা হাম্বা রবে ছুটছে।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। হাঁ, রসিক চৌধুরী মানুষ বটে, কর্ম্মী বটে, কাউন্সিলর হবার যোগ্য বটে! সবাই ব'লে উঠ্‌ল, রসিক চৌধুরী কী জয়।

আশ্চর্য্য, অবাক্ কাণ্ড! ভোট গণনায় রসিক চৌধুরীর জয় হোলো। অদ্ভুত জয়, তার পক্ষে অনেক বেশি ভোট। পাটের দালাল রতন পাল গেল তলিয়ে, যাদের পায়ে রাখতে বলেছিল, তারা তাকে পায়ে দ'লে চ'লে গেল। কপাল জোর বটে রসিক চৌধুরীর।

রসিকচন্দ্রের জয় হোলো বটে কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত! চাল কেনবার আর পয়সা নেই, যা কিছু সব গেছে। দেনার

দায়ে মাথার চুল বিক্রি! কিন্তু রতন পালকে হারাতে পেরেছে, এতেই সে খুসি। ভাগ্যি, গরুটা ছিল!

কাউন্সিলর রসিক চৌধুরীর নাম উঠ্‌ল কাগজে-কাগজে। চারিদিক থেকে তাঁর কাছে অভিনন্দন আসতে লাগল। তাঁর মতো দেশকর্ম্মীর জয় ত হবেই।

কিন্তু সেই গরুটার খোঁজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে বলে, কলকাতার কোনো কোনো পথে এমনি একটা গরু মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে। যে গরু অমন বিপদে বাঁচিয়েছে তাকে ফিরিয়ে এনে পূজো করা উচিত। কিন্তু খুঁজে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশেষে 'দৈনিক বসুমতীতে' রসিকচন্দ্র একটি বিজ্ঞাপন পাঠালেন। বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়ে বেরুলো। সেটি এই ঃ—

"একটি শাদা গরুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। গরুটির গায়ে আল্‌কাৎরায় লেখা, 'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্।' যদি কেহ খোঁজ পান্ তবে দয়া করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন অফিসে সংবাদ দিলে যথাসাধ্য পুরস্কৃত হইবেন।"

———

# কুকুর ও বিড়াল

আমাদের পাড়ায় একটা বিড়াল আর একটা কুকুর থাক্‌ত, তাদের হুজনের মধ্যে একটুও বনিবনা ছিল না। অনেক দিন অনেক গোলযোগ ঘটেছে, বহু মনোমালিন্য আর বহু বিপদ—কিন্তু আমরাই মধ্যস্থ হয়ে সব মিটিয়ে দিয়েছি, তারা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিত। একজন যখন কোথাও খাবার খুঁজে পাবে, তখন আর একজন তার প্রতি লোভ প্রকাশ করবে না, এই ছিল সর্ত্ত। আর একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, বিড়ালটা কখনো কুকুরটার সুমুখে বেরুবে না, যদি বেরোয় তবে কুকুর তাকে তেড়ে যাবে।

একদিন কুকুর পথের ধারে শুয়েছিল, বিড়ালটা গৃহস্থদের বাড়ীর জানলায় দাঁড়িয়ে বললে, পথ থেকে সরে যাও গো, আমি ওদের বাড়ী যাবো।

কুকুর চোখ খুলে তাকাল। বললে, ঘুমোচ্ছিলুম ডাক্‌লে কেন? চুপি চুপি চলে গেলেই ত পারতে, তোমার ত আর পায়ের শব্দ হয় না।

বিড়ালটা বললে, কি জানি ভাই, তোমার যদি আবার শান্তিভঙ্গ হয়! যে রকম আইন-কানুন আজকাল চালাচ্ছ,

হাত পা নাড়তেই ভয় করে। এই ব'লে সে ল্যাজটা দোলাতে লাগল।

নখ দিয়ে আঁচড়ে এখুনি রক্ত বা'র ক'রে দেবো
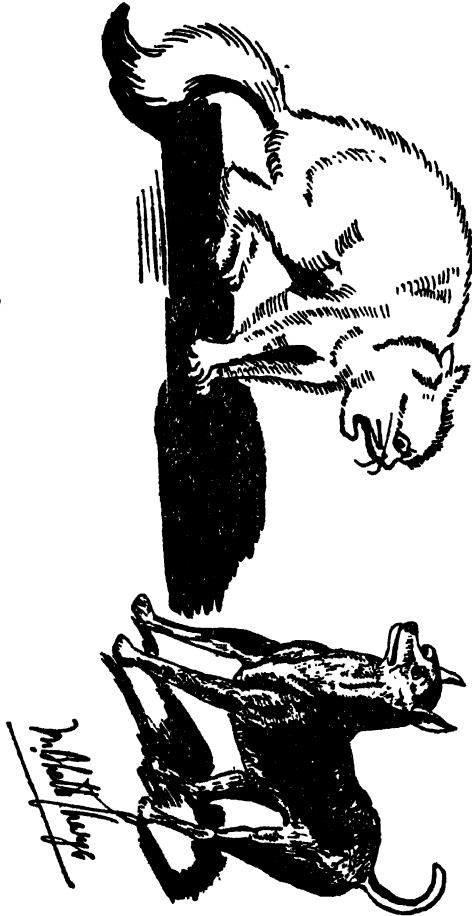
কুকুরটা বললে, ও বাড়ীতে কি মতলবে যাওয়া হবে শুনি ? মাছের গন্ধ পেয়েছ বুঝি ?

আমাকে সন্দেহ ? ছোটলোক কোথাকার ! ব'লে বিড়াল পথে নামল। কিন্তু ছোটলোক শুনেই কুকুর চোখ রাঙিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, খবরদার বলে দিচ্ছি।

এঃ, ভারি মরদ। গায়ে হাত দাও দেখি, নখ দিয়ে আঁচড়ে এখুনি রক্ত বা'র ক'রে দেবো।—বিড়ালের ল্যাজ আর গোঁফ ফুলে উঠ্‌ল।

কুকুর বললে, তুমি ত চুরি ক'রে খাও !

বেশ করি। তুমি যে গোয়েন্দা পুলিশের মতন দিনরাত এদিকে ওদিকে শুঁকে শুঁকে খাবার খোঁজে খোঁজে বেড়াও ?

জবাব শুনে কুকুর মুখের একটা শব্দ করলে। বললে, বটে ! যাদের আঁস্তাকুড়ে খুঁটে খাই, তাদের ঘরের চোর তাড়াই। তুমি কি করো ? মাছ আর দুধ চুরি ক'রে খাও আর চোর এলেই গা ঢাকা দাও !

অপমানে বিড়ালের চোখে কান্না এল। বললে, আমি যদি না ইঁদুর মারতুম তবে গেরস্থদের এতদিন সর্ব্বস্ব নষ্ট হোতো। তুমি আমাকে পথে পেয়ে অপমান করবার কে ? পথের কুকুর আর কত ভালো হবে !—এই ব'লে সে এক

লাফে একটা বাড়ীর ভিতরে পালিয়ে গেল। কুকুর গরগর করতে লাগল। বললে, সুবিধে যদি পাই দেখে নেবো।

কিছুকাল পরে কুকুরের তিনটে বাচ্চা হোলো। ছোট ছোট এত টুকু-টুকু বাচ্চা। কিন্তু পথের কুকুরকে ঠাঁই দেবে কে? সুতরাং আঁস্তাকুড়ের ধারে তারা থাকে। কেঁউ কেঁউ ক'রে ডাকে, তাদের মা খাবার এনে খাওয়ায়। এমনি ক'রে তারা বড় হতে লাগল। একদিন পথের মাঝখানে বিড়ালের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কুকুর বললে, কেমন আছ ভাই?

বিড়াল বললে, আর ভাই গরীবের আর থাকাথাকি কি বলো? খেটে ত খেতে হয়। ছেলেপুলেদের সময় মতো খাওয়াতে পারিনে।

তোমারও ছেলেপুলে হয়েছে?

হয়েছে বৈ কি, একসঙ্গে পাঁচটি।

কোথায় তারা?

ওই গেরস্থদের বাড়ীর সিঁড়ির তলায়। ওদের বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলো ভারি অত্যাচার করে। দুর্ব্বলের আশ্রয় কোথাও নেই!—এই বলে বিড়াল চলে গেল।

সত্য কথাই বিড়াল বলেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বিড়াল আর কুকুরের জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা চলে গেল। কুকুরের একটা বাচ্চা গাড়ী চাপা পড়ল, আর

একটাকে কে যে কোথায় নিয়ে গেল, তার আর সন্ধানই মিল্‌ল না। বিড়ালের ভাগ্যেও তাই। ছোট ছেলেমেয়ে মিলে একটা বিড়ালছানাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে হত্যা করল, একটা মরল, না খেতে পেয়ে। একটিকে ওবাড়ীর পিসিমা নিয়ে দেশে চ'লে গেলেন, সেইটি দেখতে সকলের চেয়ে ভালো। আর দুটি বাকি আছে। জানিনে তাদের ভাগ্যে কি ঘট্‌বে যারা দুর্ব্বল আর নিরাশ্রয় তাদের ভগবানও নেই।

বিড়াল একদিন পিছন থেকে ডাক্‌ল, কুকুর, কেমন আছ।

কুকুর বললে, এখন বেশ আছি, কোনো ঝঞ্ঝাট্‌ নেই।

সত্যি, আমিও বেশ আছি। দেখো, এর পরে যদি আমাদের বাচ্চা হয় তাদের কি উপায় করব ?

কুকুর বললে, খেয়ে ফেললে কি হয় ?

ওমা, সে কি কথা ভাই ? খেতে ইচ্ছে করে বটে, কিন্তু আমার ভাই মায়া হয়।

সেটা বর্ষাকাল। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বেলা অপরাহ্ন। বাইরের উঠোনে জল জমেছে। গৃহস্থদের রান্নাঘরে কেউ ছিল না, ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিড়ালটা আস্তে আস্তে ঢুকে উনুনের পাড়ে উঠে চুপ ক'রে

বসল। ইলিশ মাছের গন্ধ পেয়ে সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, কিন্তু সন্ধান না পেয়ে গরম উনুনের পাড়ে বেশ আরাম ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে বসে চোখ বুজল। এমন সময়

আজ এ বেশে কোথায় যাচ্ছ

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কুকুর উঠোনে এসে দাঁড়াল, কি যেন মতলব তার।

বিড়াল তার দিকে তাকিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি

হাসল। বললে, তিড়িং তিড়িং পা ফেলে এখানে কেন গো ? আমি বাপু জলে ভিজতে পারিনে, বেশ দিব্যি এখানে বসে আছি। এখান থেকে পালাও বাছা, নৈলে এখুনি বাড়ীর লোকদের ব'লে দেবো।

কুকুরের মনে ভারি ব্যথা বাজল। ভাবলে, তাকে কি সংসারে সবাই এমনি ক'রে অবজ্ঞা করবে ? কেউ কি তাকে একটু স্নেহের চোখে দেখবে না ? একবার উপর দিকে তাকাল, তারপর বললে, আচ্ছা ভাই, তুমিই থাকো, আমি চ'লে যাচ্ছি, তোমার জয় জয়কার হোক্।—এই ব'লে কুকুর মনের দুঃখে চ'লে গেল।

সেদিন রাত্রে বিড়ালের জয় জয়কারই হোল। হাঁড়ির ভিতর থেকে ইলিশ মাছ, বাটির দুধ, ডেক্‌চির ভাত,—প্রচুর আহার ক'রে বিড়াল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাস্তবিক এমন খাওয়া সে অনেককাল খেতে পায়নি। আগামী তিনদিন তার না খেলেও চ'লে যাবে।

কিন্তু বিধি নির্দ্দয় ! পরদিন সকালে সে ধরা পড়ল। গৃহস্থদের হাতে ভীষণ মার খেয়ে সে চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু তা'তেও বাড়ীর লোকের রাগ পড়ল না, তার গলায় দড়ি বেঁধে তারা তাকে দেশছাড়া ক'রে দিয়ে আসতে গেল।

হিঁচড়ে হিঁচড়ে রাস্তা দিয়ে যখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন পথে কুকুরের সঙ্গে দেখা। কুকুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, কি গো, কাল যে বড় লম্বা লম্বা কথা বলেছিলে, আজ এ বেশে কোথায় চলেছ ?

বিড়ালটা তার দিকে একবার ফিরে তাকাল, তাকিয়ে একটু হেসে বললে, ভাই সংসারের অসারতা বুঝে এবার হরিনামের মালা নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

কুকুরটা বোকার মতো তার দিকে চেয়ে রইল। তা হবেও বা !

# আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য